সমাজে ও রাজনীতিতে সৌজন্যতা কি মরে যাচ্ছে?

জহর সরকার,

দেশ পত্রিকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

২০১৬ তে যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রচারে তাঁর সেই কুখ্যাত, কুৎসিততম ভাষা ব্যবহার করছিলেন, ঠিক তখন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কীথ জে বাইবি (Keith J. Bybee) তাঁর 'How Civility Works' (সৌজন্যতা কি করে সফল হয়) বইতে বেশ কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি তাঁর দেশ কি করে ধাপে ধাপে এক অসভ্য বর্বর রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। সাধারণ মানুষের উগ্র ব্যবহার থেকে শুরু করে তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বেশ কয়েকটি দিক তুলে ধরেছিলেন। তিনি অন্যান্য বিষয়ের সাথে সামাজিক মিডিয়ার ভূমিকা ও অশালীন ভাষার ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু তিনি গবেষক, তাই নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন করেন নি বা ইতিবাচক প্রস্তাবও দেন নি। অনেকেই অবশ্য বলেন যে নির্বাচেনর আগে চেঁচামেঁচি আর তীব্র আক্রমণ বাড়াটা খুবই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে আপত্তিজনক ভাষার ব্যবহার শুধু ভোটের উত্তেজনার সময় সীমিত থাকছে না। আমাদের দেশেই স্পষ্ট দেখছি এই অভদ্রতা এখন লাগাতার চলেছে, যখন তখন, অবিশ্রান্ত ভাবে। দেশের ও রাজ্যের রাজনীতিতে সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন স্তরে এত অশালীন কথা, ইঙ্গিত ও প্ররোচনা এর আগে আমরা কখনোই দেখি নি। রাজনীতি এবং ওকালতি, এই দুই ক্ষেত্রে তর্ক বিতর্কওই হল প্রাণ। তাই এই দুটি পেশাতে সৌজন্যের এক বিশেষ স্থান আছে যা সত্যিই অপরিহার্য। দিন রাত যখন পরস্পর বিরোধী মতামত জাহির করতে হয়, তখন মুখপাত্রদের আসল অস্ত্র হল যুক্তি আর তথ্য। উকিলেরা সহজেই বুঝেছেন যে গলাবাজি আর গালিগালাজ করলে তর্ক তো জেতা যায়ই না, শুধু রক্তচাপ বাড়ে আর হৃৎপিন্ডের ক্ষতি হয়। রাজনীতিবিদরা কিন্তু দিনের পর দিন তাঁদের বাকযুদ্ধ আরও তীব্র ও অপ্রীতিকর করেই চলেছেন।

বর্তমান রাজনীতির আখড়ায় ভদ্র ভাষার ও ব্যবহারের এত অপ্রতিরোধ্য অবনতি হল কেন? শাসক দলই হোক বা বিরোধী সৌজন্যতার অভাব সত্যি দৃষ্টিকটু। বামফ্রন্টের আমলে যদিও সকলকেই আপনি বলে সম্বোধন করা হত, আমরা কয়েক বার অশ্রাব্য কথার প্রয়োগও শুনেছি। এক নেত্রীকে ভাতার আখ্যা দেওয়া ও আর কত নোংরা গালিই না শুনতে হয়েছে। তাঁদের আরামবাগের এক সাংসদের মুখে কিছুই আটকাতো না। একবার তো নিষিদ্ধ পল্লীর মহিলাদের সাথে তুলনা করতে গিয়ে তাঁকে ক্ষমা চাইতে তো হয়েই ছিল, নিজের দলকেও তিনি যথেস্ট বিপাকে ফেলেছিলেন। আর এক নেতা তো সব সময় বলতেন বিরোধীদের পশ্চাতদেশ দেখিয়ে দেবেন। কিন্তু তার পরে বাংলার রাজনীতিতে অসভ্য ভাষার ব্যবহার যেন আরো কয়েকগুন বেড়েছে। সর্বোচ্চ মহলেও অনেক সময় যথেষ্ট আপত্তিজনক কথা শোনা গেছে। বাঙলার মতন একটি রাজ্য যেখানে কথায় কথায় সংস্কৃতি

আর সভ্যতার গর্ব করা হয় সেখানে জনসভায় শালা কথাটিও ব্যবহার করতে আটকায় নি। দলের এক উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিও জোর গলায় বলেছেন তাঁরা নাকি অন্য দলের লোকেদের চোখ উপড়ে ফেলবেন, হাতও কেটে দেবেন। ওই দলের এক সাংসদ মুক্ত জনসভায় বিরোধী দলের মহিলাদের ধর্ষণ করার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিলেন। কারোর রুচিতেও আজ বাধে না প্রতিদ্বন্দীদের বাঁদর, কুকুর, সাপ আরো কত সব পশুদের নামে ডাকতে।

কদুক্তির এই লড়াইয়ে কেউ ছাড়ার পাত্র নয়। একটি দলের রাজ্য সভাপতি হুঙ্কার করেছেন তাঁর বিরোধীদের হাড়গোড় ভেঙে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবেন, অথবা সোজা শ্মশানে। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন যারা প্রতিবাদ করছে তাঁর দল ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুধ্যে তাদের কুকুরের মতন গুলি করে মারা উচিত। এই ব্যক্তি এতই প্রকাশ্যে সকলকে গালমন্দ করেন যে তাঁকে অসভ্য বলে কেউ সময় নষ্ট করতে চান না। কিন্তু সত্যিই দুঃখ লাগে যখন আমরা দেখি এই রাজ্যের রাজ্যপাল কি ভাবে তাঁর পদের ঐতিহাসিক মর্যাদা ক্ষুন্ন করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সব বিষয়ে টুইটার যুদ্ধে নামেন। দুই পক্ষের উক্তিগুলির মধ্যে সৌজন্যের তো কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। আসলে মুস্কিল হল রাজ্যপালেরা যখন তাঁদের শ্রদ্ধার আসনে বসে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে ইচ্ছাকৃত ভাবে জড়িয়ে পড়েন। এটা তাঁদের শিষ্টাচারে বাধা উচিত। তা যে হয় না আমরা বুঝতে পারি যখন দেখি ওই উচ্চপদের সন্মান গ্রহণ করেও একজন চেনা রাজ্যপাল কি ভাবে সকলকে উস্কানি দেন। জুন ২০১৭তে তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কে উদ্ধৃত করে হিন্দু মুসলমানের গৃহযুদ্ধের কথাও বলতে পারলেন। জানি না তাঁর মহান নেতাকে খুশি করার জন্যে বলেছিলেন কি না, তিনি ২০১৫র মার্চে সাফ বড়াই পর্যন্ত করলেন যে গুজরাটের ২০০২এর দাঙ্গাতে হিন্দুরা যা করেছে তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

এই অশালীনতার প্রতিযোগিতা যে শুধু এখানেই দেখা যাচ্ছে তা নয়। উত্তর প্রদেশের নির্বাচনী সভায় এক বিশাল মাপের জাতীয় নেতা একটি সম্প্রদায়ের মানুষকে কবরের কথা মনে করিয়ে দেন। কয়েক বছর আগে তিনি এক মন্ত্রীর স্ত্রী কে “পঞ্চাশ কোটি টাকার গার্লফ্রেন্ড” বলে হেয় করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি এক জাতীয় দলের নেত্রীকে বিদেশী জার্সি গরু আর তাঁর সন্তানকে দোআঁশলা বাছুর বলতেও ছাড়েন নি। অন্য দিকে দেখা গেল এক সর্বভারতীয় দল এই দেশের প্রধান মন্ত্রীকে “চৌকিদার চোর হ্যায়” বলে শুধু ডাকলই না, এটিকে তাদের স্লোগানে পরিণত করল। তাঁদেরই এক অক্সফোর্ড থেকে পাস করা নেতা বিরোধীদের নামকরে এত অসভ্য ভাষা প্রয়োগ করতেই থাকেন যে অনেকেই তাঁকে এখন ভাঁড় বলতে শুরু করেছে। অবনতি কি পর্যায় পৌঁছেছে আমরা বুঝতে পারলাম যখন গত বছর ৭ই ফেব্রুয়ারী রাজ্য সভার সভাপতির নির্দেশে খোদ প্রধানমন্ত্রীর বলা কয়েকটি ‘unparliamentary’ শব্দ সংসদের নথি থেকে খারিজ করা হল। এই স্তরের ঘটনা সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে প্রায় নজিরহীন।

আর এই ব্যাধিটি শুধু আমাদের দেশে সীমাবদ্ধ নয়, পৃথিবীর বেশ কয়েকটি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং প্রাচীন গণতন্ত্রেও এই আচরণ যথেষ্ট প্রকট। মার্কিন যুক্তরাষ্টের ভদ্র ও শিক্ষিত মানুষ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি যে ডোনাল্ড

ট্রাম্পের মত এত নিম্ন মানের একজন ব্যক্তি তাদের রাষ্ট্রপতি হতে পারেন। চার বছর পর নির্বাচকেরা অসাধারণ কষ্ট করে তাঁকে সরাতে পেরেছেন, কিন্তু তা মাত্র ৪ শতাংশ ভোটের ব্যবধানে। এর অর্থ হল ৪৭ শতাংশ মার্কিনি নাগরিকেরা এখনও ট্রাম্পকেই চায়। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ওই অসভ্য ভাষাই তাঁদের মনের কথা আর প্রাণের মধ্যে পোষণ করা বিদ্বেষ সঠিক ভাবে ব্যক্ত করতে পারে। যত অসম্ভবই লাগুক না কেন আমাদের এই রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হতেই হবে। আমরা আরো প্রচুর উদাহরণ দিতে পারি, কিন্তু তাতে আমরা শুধু রোগের লক্ষণ নিয়েই কথা বাড়াবো। শিকড়ে পৌঁছতে গেলে আমাদের সর্বপ্রথম মানতে হবে যে বর্তমান দুনিয়ায় মানব জাতির এক বৃহৎ অংশ গণতন্ত্র, বহুতত্ত্ববাদ, সহিষ্ণুতা আর সহাবস্থানে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে বা তা ফেলার মুখে। ট্রাম্প বা মোদী অথবা রুসের পুতিন তুরস্কের রেচেপ এরদোয়ানের মত পপুলিস্ট নেতারা এই নিরাশার সৃষ্টিকারী নন, তাঁরা কেবলমাত্র এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছেন আর বিষাক্ত আবহাওয়াকে আরো ভয়ানক করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

এই মহানায়কদের আবির্ভাবের অনেক আগেই রফিক জাকারিয়া ১৯৯৭এ তাঁর 'Rise of Illiberal Democracy' তে বিশ্লেষণ করেছিলেন অনুদার গণতন্ত্রের উত্থান কি করে সারা বিশ্ব জুড়ে বাড়ছিল। তিনি আমাদের দেখালেন পশ্চিম ইউরোপে আর উত্তর আমেরিকায় যে উদারপন্থী গণতন্ত্র বিদ্যমান তা অন্য অনেক দেশেই শিকড় গজাতে পারে নি। তাই বেশ কয়েকটি গণতন্ত্রে রাজনৈতিক ঔদার্য ও সহনশীলতা অধিষ্ঠান করে না। তিনি লেখার মাত্র ছয় সাত বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটেছিল আর তার সাথে সাথে পুর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টির একচেটিয়া ও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক শাসনেরও অবসান হল। কিন্তু তখনও এই ইউনিপোলার দুনিয়াতেও উগ্র দক্ষিনপন্থীরা তেমন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে নি। তবে তথাকথিত সাম্যবাদী ধংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে পুঁজিবাদের অপ্রতিরোধ্য জয়জয়কার খুবই দৃশ্যমান। এক দিকে এক শ্রেণীর কোলাহলপুর্ন উল্লাস আর অন্য দিকে অর্থনৈতিক বৈষম্যের অনিয়মতান্ত্রিক উর্দ্ধগতি। অবশ্য আর মাত্র কয়েক বছর পরেই এই লাগামহীন পুঁজির তাণ্ডব আমেরিকার শেয়ার বাজার আর অর্থনীতিকে নিয়ে গেল এক ভয়ংকর বিপর্যয়ের মূখে। বিশ্বের প্রচুর দেশ ও অর্থনীতির এত বিধ্বংসী ক্ষতি হওয়ার পরেও দেখা গেল অনিয়ন্ত্রিত, মুক্ত অর্থনীতিবাদ আর ধনতন্ত্র যেন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এবং অনাক্রমনীয় রূপ ধারন করেছে। এই সময় সাধারণ মানুষের মধ্যে নৈরাশ্য বাড়তে থাকল আর অনেকেই অখ্যাত সাম্যবাদ পরিত্যাগ করার পর দক্ষিণপন্থী পপুলিসামের দিকে আকর্ষিত হল। দেখা গেল জনপ্রিয়তাবাদী (populist) রাজনীতির এক ঐতিহাসিক উর্ধ্বগতি। ক্যারিশম্যাটিক দক্ষিণপন্থী নেতারা সাধারণ মানুষের এই তীব্র আশাহীনতাকে নিজেদের সুবিধার্থে ব্যবহার করে মাথাচাড়া দিলেন। হাংগারিতে ওরবান, ফ্রান্সে লা পেন, পোল্যান্ডে মারুসিক, ব্রিটেনে বরিস জনসন, ব্রাজিলে বোলসোনারো এবং ভারতবর্ষে নরেন্দ্র মোদী। এরা সকলেই নিজেদের স্ট্রংম্যান বা অতিশক্তিমান নেতা হিসাবে নিজেদের জাহির করলেন। এই পদ্ধতি অবলম্বন করেই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির স্বত্বভোগীরাই তাঁদের সমর্থিত এক শ্রেণীর জনপ্রিয় নেতাদের এগিয়ে দিলেন আর প্রচুর সাহায্য করলেন। মানে এই সময়কার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে যে উষ্মা ফেটে উঠছিলো বৃহৎ পুঁজি তার নিজের স্বার্থে তা ব্যবহার করতে সমার্থ হল।

কিন্তু এই কৌশলের সাফল্যের জন্য অন্য কাউকে দোষী সাব্যস্ত তো করতেই হয়। সেই চিহ্নিত শত্রুর বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা অত্যন্ত প্রয়োজন -- সে ব্রিটেনের জনসনের ইউরোপ বিদ্বেষী ব্রেক্সিট ই হোক বা ট্রাম্পের কৃষ্ণবর্ণীয়দের বিরুদ্ধে জেহাদই হোক। অথবা মোদীর সংখ্যালঘুদের উপর পীড়নই হোক। কুৎসিত গালি, অবজ্ঞা, ঘৃনা আর সহিংসতা হয়ে উঠল তাঁদের ভক্তদের পবিত্র কর্তব্য। এবং তাঁদের রাষ্ট্রনীতিতেও এই মনোভাব বিশেষ সম্মানের স্থান পেল। জনাথন হাইডট তাঁর বিখ্যাত বই The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion এ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী কি করে নৈতিকতাকে তাঁদের নিজেদের পৃথক দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা থেকেই দেখেন। তাই আজ সমাজে ও রাজনীতিতে এই ভয়ানক বিভাজন দেখা দিয়েছে। আর সকলেই গলা ফাটিয়ে একই সাথে দাবি করছেন যে তাঁদের চিন্তা, আদর্শ বা অন্যের প্রতি অসহিষ্ণুতাই সঠিক এবং একমাত্র ন্যায়সঙ্গত আদর্শ। এই ব্যাখ্যা দিয়ে আমরা কখনোই বলার চেষ্টা করছি না যে রাজনৈতিক বা সামাজিক জীবনে বর্তমান অশোভনতার জন্যে একমাত্র দক্ষিণপন্থীরাই দায়ী। এটাও দাবি করছিনা যে অতীতে এই ধরনের অসভ্য আচরণ ছিল না। আমরা শুধু অনুধাবন করার প্রয়াস করছি মাত্র যে এত সর্বব্যাপী আর সর্বগ্রাসী হল কি করে। আমাদের মানতেই হবে যে বিশ্বজুড়ে এই দক্ষিনপন্থীর সুনামী তো আগে কখনও দেখা যায় নি। ১৯২০ ও ১৯৩০এর দশকে যখন ফ্যাসিবাদ গজালো, স্পেন, ইতালি আর জার্মানির বাইরে খুব একটা দেখা যায় নি। কিন্তু এখন তো এরকম দেশের সংখ্যা আঙুলে গোনা যাচ্ছে না। এই রাজনীতির এক প্রধান বৈশিষ্ট হল অপরের সাথে দুর্ব্যবহার করা। এর পূর্বের আমরা অনেক গল্প শুনেছি। যেমন শুনেছি রাজনৈতিক বিরোধ থাকা সত্তেও মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় আর বিরোধী নেতা জ্যোতি বসুর মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু আর তাঁর বিপক্ষের সাংসদ অটল বিহারি বাজপেয়ির সম্পর্ক খুবই সুমধুর আর সন্মানযুক্ত ছিল। এই সব স্মৃতি ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান পেয়েছে। আজকের বিদ্বেষের আবহাওয়ায় এই কিংবদন্তি বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন।

এ ছাড়াও অবনতির অন্য কারণ নিশ্চই আছে। আগের তুলনায় বর্তমানে রাজনীতিতে বহু গুন টাকা এবং ক্ষমতা পাওয়া যায়। তার জন্যে তিক্ততাও অনেক বেশি।প্রতিযোগিতা এক মরিয়া যুদ্ধে পরিণত হয়েছে, যেখানে ভাষা ও ব্যবহার যথেচ্ছ হতেই পারে। তা ছাড়া তথ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে রাজনীতিতে অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিতের সংখ্যাও এখন অনেক বেশি। দুঃখের বিষয় হল যে আজ অব্দি আমরা সঠিক জানি না আমাদের দেশের শীর্ষে যিনি আছেন তিনি কতদূর পড়াশুনা করেছেন বা কোথা থেকে কি পাশ করেছেন। লোকে বলে যে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও কথাবার্তায় সাধারণত শিক্ষার একটি প্রভাব থাকে। যদিও সব ক্ষেত্রে তা নয়। আর এটাও অনস্বীকার্য যে আধুনিক গণমাধ্যমে শ্রোতা, দর্শক, পাঠক বা TRPর জন্যে সকলকেই প্রচন্ড লড়তে হয়। তাই অনেক রাজনীতিবিদেরা মনে করেন যে একমাত্র চাঞ্চল্যকর বিবৃতি আর উগ্র উক্তি করলেই শিরোনাম কাড়া যায়। আজ আমাদের পাবলিক জীবনে সৌজন্যতা, শিষ্টতা আর সহিষ্ণুতা ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা সত্যিই কম।